সামাজিক নাটকটি লিখে গিরিশ ঘোষ যখন জনপ্রিয়তার শীর্ষে, তখন মনোমোহনও লিখলেন একটা সামাজিক নাটক 'আনন্দময় নাটক' (১৮৯০), প্রণয় পরীক্ষা। প্রণয় পরীক্ষার বিষয় বহুবিবাহ জনিত সমস্যা। কাহিনী বিন্যাস ও চরিত্র সৃষ্টিতে নাট্যকার কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পেরেছেন। 'আনন্দময়' নাটকের নায়ক আনন্দময়, তাঁর পুত্র এবং পৌত্রদের নিয়ে যে বিপত্তি মধ্যে পতিত হন এবং তা থেকে কীভাবে উদ্ধার পান, তা দেখানো হয়েছে। এটাকে পারিবারিক নাটকও বলা যায়।

যুগের চাহিদার কথা মনে রেখেছিলেন বলেই মনোমোহন বসু প্রহসন রচনাতেও আগ্রহ দেখিয়েছেন। 'নাগাশ্রমের অভিনয়' তার লেখা প্রহসন, ১৮৭৫ সালে লেখা। তাঁর নাটক আর প্রহসনের বিষয় উপযুক্ত হলেও পরিবেশন নৈপুণ্য তেমন না থাকায় নাটকগুলি জনপ্রিয় হতে পারেনি। তবু সামাজিক নাটকগুলির চরিত্রচিত্রণে তাঁর কৃতিত্ব অস্বীকার করা যাবে না।

প্রশ্ন ১৪। ঐতিহাসিক নাটক রচনায় গিরিশচন্দ্র ঘোষ কতটা সফল, আলোচনা করো।

উত্তর। উনিশ ও বিশ শতকের শ্রেষ্ঠ মঞ্চসফল নাট্যকারদের মধ্যে গিরিশচন্দ্র ঘোষ অন্যতম। রঙ্গমঞ্চের চাহিদা মেটাতে বিভিন্ন রকমের শতাধিক নাটক তিনি রচনা করেন। তার মধ্যে ঐতিহাসিক নাটকও আছে। অনেকগুলি ঐতিহাসিক নাটক তিনি রচনা করেন, তার মধ্যে 'কালাপাহাড়' (১৮৯১), 'সৎনাম' (১৯০৪), 'সিরাজদ্দৌলা' (১৯০৬), 'মীরকাশিম' (১৯০৬), 'ছত্রপতি শিবাজী' (১৯০৭), 'অশোক' (১৯১০) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এগুলির মধ্যে মঞ্চসফল নাটক 'সিরাজদ্দৌলা'। স্বদেশী আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে এটা লেখা। সার্থক ঐতিহাসিক নাটক লেখার সময় নাট্যকারকে মনে রাখতে হয়, যথার্থ ইতিহাসের বিকৃতি যেন না ঘটে। অবান্তর বিষয় বা অনৈতিহাসিক বিষয় যেন প্রাধান্য পেয়ে না যায়। এর জন্য নাট্যকারকে ইতিহাসটা ভালো করে জানতে হয়। নাট্যকার গিরিশচন্দ্র নাটক মঞ্চস্থ করার ব্যাপারে এতটাই ব্যস্ত থাকতেন, যে ইতিহাস নিয়ে পড়াশোনার অবকাশ তাঁর ছিল না। সাধারণত, স্কুলপাঠ্য ইতিহাসে বইয়ের উপর ভরসা করে, তার সঙ্গে কল্পনা মিশিয়ে ইতিহাসের ঘটনা বিন্যাস, চরিত্র সৃষ্টি ও পরিণতি ঘটাতেন। এতে ইতিহাসের তথ্য বিকৃতি ঘটেছে; তাই অধিকাংশ ঐতিহাসিক নাটক সার্থকতা পায় নি। কেবল 'সিরাজদ্দৌলা' (১৯০৬) আর 'মীরকাশিম' (১৯০৬) সাফল্য পেয়েছে। কারণ, নবাবী আমলের ইতিহাস নিয়ে তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম সহ পড়াশোনা করেন, তথ্য অনুসন্ধান করেন। 'ছত্রপতি শিবাজী' নাটকটিতে মঞ্চসফল হতে পেরেছে। নায়কদের মধ্যে দেশপ্রেম ও বীরত্ব যেভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে তাতে দর্শকগণ উদ্বুদ্ধ হতে পেরেছেন, ইতিহাসের রস এবং জ্ঞান লাভ করেও ধন্য হয়েছেন।

প্রশ্ন ১৫। 'বিল্বমঙ্গল' কার লেখা? কোন্ শ্রেণীর গ্রন্থ? এটি কত সালে প্রকাশিত হয়? এর গুরুত্ব বিচার করো।

উত্তর। 'বিল্বমঙ্গল' গিরিশচন্দ্র ঘোষের লেখা মহাপুরুষ জীবনীমূলক নাটক। এটি ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত। রামকৃষ্ণের ভক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ রামকৃষ্ণের তিরোধানের পর এই নাটকটি রচনা করেন। ভক্তমাল গ্রন্থ থেকে এর আখ্যান সংগৃহীত হয়। এই আখ্যানকে ঘষে মেজে নাটকের উপযুক্ত করা হয়। নায়িকা চিন্তামনির ভাবের পরিস্ফূটনে সহায়ক হিসেবে থাকমণির চরিত্র সৃষ্টি। রামকৃষ্ণের এক ভক্ত পাগলিনীর চরিত্রের আদলে চিন্তামণি চরিত্র পরিকল্পিত। পার্থিব প্রেমে ব্যর্থ হয়েই এই পাগলিনী নাকি ঈশ্বর প্রেমে মাতোয়ারা হয়। বিল্বমঙ্গল ও পার্থিব প্রেমে ব্যর্থ হয়ে ভগবানের প্রেমে মাতোয়ারা হয়েছেন। জমিদারপুত্র বারবনিতা চিন্তামণিকে এতটাই ভালোবাসে

যে পিতৃশ্রাদ্ধের দিনেও সে খাবার সহ চিন্তামণির কাছে পৌঁছাতে চায়। নৌকা না পেয়ে গলিত শবদেহ আশ্রয় করে নদী পার হয়েছে। দড়ির অভাবে সাপের লেজ ধরেই প্রাচীর লঙ্ঘন করেছেন। এসব জেনে বিরক্ত চিন্তামণি বিল্বমঙ্গলকে বিদ্রূপ করে, এমন ভালোবাসা ঈশ্বরের প্রতি থাকলে বিল্বমঙ্গল এতদিনে ঈশ্বরকে পেয়ে যেতেন। বিল্বমঙ্গল এরপর ঈশ্বরের আরাধনাতেই মন নিবিষ্ট করেন এবং তাঁকে পেয়ে ধন্য হন। নাটকের বিষয় এমন ভাবে পরিবেশিত হয় যে ভক্তদর্শকরা এ নাটক দেখে যথেষ্টই আপ্লুত হয়েছেন।

প্রশ্ন ১৬। টীকা লেখো 'প্রফুল্ল'।

উত্তর। উনিশ শতকের শেষভাগে বাংলার সবচেয়ে জনপ্রিয়, মঞ্চসফল সামাজিক নাটকটির নাম 'প্রফুল্ল' (১৮৮৯)। গিরিশচন্দ্র ঘোষের শ্রেষ্ঠ নাটক এটা। এ নাটকের বিষয় সম্পদের মোহ থেকে জন্মানো ভ্রাতৃবিরোধ কিভাবে একটা পরিবারকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিল তারই বিয়োগান্ত চিত্র। যোগেশের একটুখানি অসচেতনতা, রমেশের বিষয় লোভ, স্বার্থপরতা, ছোটো ভাই সুরেশের ঔদাসীন্য যোগেশের সাজানো বাগান শুকিয়ে যেতে সাহায্য করল। ব্যাঙ্ক ফেল হবার একটা মিথ্যা গুজব যোগেশের পরিবারটাকে যেন মাটিতে আঁছড়ে শেষ করে দিয়েছে। ব্যাঙ্ক ফেল হবার মিথ্যা খবরে যোগেশ দিশেহারা হয়ে পড়েন, অতিরিক্ত মদ্যপানে বেসামাল হয়ে পড়েন। সেই সুযোগে অ্যাটর্নি ভাই রমেশ কিছু কাগজে স্বাক্ষর করিয়ে নিয়ে যোগেশের সম্পত্তি সব নিজের করে নেয় এবং যোগেশকে মাতাল অপবাদ দিয়ে তার স্ত্রী-পুত্র সহ বাড়ি থেকে বের করে দেয়। যোগেশের স্ত্রী অনাহারে, বিনা চিকিৎসায় রাস্তায় মারা যায়। রমেশ পরিবারের একমাত্র উত্তরাধিকারী যাদবকে তুলে এনে চিকিৎসার নামে ঔষুধ খাইয়ে মারতে চায়। রমেশের স্ত্রী প্রফুল্ল তাকে বাঁচাতে গেলে রমেশ তাকেও গলা টিপে হত্যা করে। পরিশ্রম করে যোগেশ যে সুখী পরিবারটি সাজিয়ে তুলেছিল, সেই সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল।

নাটকটি এতটাই জনপ্রিয় হয় যে একটানা বহু রজনী অভিনীত হয়ে রেকর্ড করে। তাই এই নাটকের অনুসরণে আরও সামাজিক নাটক রচিত হয়।

প্রশ্ন ১৭। 'পুরুবিক্রম' কার লেখা, কোন্ শ্রেণীর নাটক? কোন্ সালে প্রকাশিত? 'পুরুবিক্রম' নাটক হিসেবে কতটা সার্থক? আলোচনা করো।

উত্তর। 'পুরুবিক্রম' জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা একটি ঐতিহাসিক নাটক। এটি ১৮৭৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত। এই শ্রেণীর নাটক জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আরও কয়েকটি লিখেছেন, যেমন—'সরোজিনী', 'অশ্রুমতী', 'স্বপ্নময়ী' ইত্যাদি।

'পুরুবিক্রম' ঐতিহাসিক নাটক হিসেবে বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। এর দেশপ্রেম পরাধীন বাঙালী জাতিকে বেশ অনুপ্রাণিত করেছিল। গ্রীক বীর আলেকজাণ্ডার ও পুরুর যুদ্ধ কাহিনী নিয়ে এই নাটকটি রচিত। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ঐলবিলা ও পুরুর প্রেম কাহিনী। সেকেন্দার শাহর সঙ্গে অম্বালিকার প্রেমও এতে স্থান পেয়েছে। তবে দর্শকদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে নির্ভীক। দেশপ্রেমিক পুরুর বীরত্বপূর্ণ সংলাপগুলি। দেশাত্মবোধক গানগুলি তখন অনেক দর্শক কণ্ঠে তুলে নিতেন।

ইতিহাসের তথ্যকে মর্যাদা দিয়ে নাটকের শেষে আলেকজাণ্ডার কর্তৃক পুরুর পরাজয় দেখানো হয়েছে। তাই এটি বিয়োগান্তক নাটক হয়েছে। এর প্রশংসা অনেকের মুখেই শোনা গেছে।

শোত্মবোধক নাটক বলে গুজরাটি ভাষায় নাটকটির অনুবাদ করা হয়েছে। নাটকে সেকেন্দার শা, কে, অম্বালিকা প্রভৃতি চরিত্র যথেষ্ট নাটকীয় সার্থকতা লাভ করেছে।

প্রশ্ন ১৮। কোন্ নাটক বা প্রহসন রচনা করে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের খ্যাতি সর্বাধিক বৃদ্ধি পায়? সেটি কত সালে প্রকাশ? তার নাটকীয় সার্থকতা নিয়ে আলোচনা করো।

উত্তর। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর 'অলীক বাবু' নামের প্রহসনটি রচনা করে যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ১৮৭৭ সালে লেখা 'এমন কর্ম আর করব না' প্রহসনটিই পরে ১৯০০ সালে 'অলীকবাবু' নামে প্রকাশিত হয়।

প্রহসনটির নায়িকা হেমাঙ্গিনী বড়োলোকের আদুরে মেয়ে। উপন্যাস পড়ে পড়ে উপন্যাসের নায়িকাদের মতো ছলাকলায় তার আগ্রহ জন্মায়। তাই তেমনি আচার-আচরণ করতে থাকে। কৃত্রিম আচার-আচরণের জন্যই সে যাত্রা গানের সখীতে পরিণত হয়। প্রবঞ্চক ও মূর্খ অলীক কপটতার সাহায্যে হেমাঙ্গিনীকে বিবাহ করার ষড়যন্ত্র করে ধরা পড়ে যায়। হেমাঙ্গিনীর বাবা সত্যসিন্ধ, জগদীশবাবু, অলীকবাবু প্রভৃতি চরিত্র বেশ বিকশিত হয়ে উঠেছে। এর কৌতুকরসও বেশ উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। ঠাকুরবাড়ির নাট্যশালায় রবীন্দ্রনাথও এই প্রহসনে অভিনয় করেছিলেন। অসাধারণ কৌতুকরস সৃষ্টি করতে পারার জন্যই 'অলীকবাবু' উনিশ শতকের একটি স্মরণীয় প্রহসন হয়ে রয়েছে।

প্রশ্ন ১৯। রাজকৃষ্ণ রায় নাট্যকার হিসেবে কতটা প্রতিভার পরিচয় দিতে পেরেছেন?

উত্তর। উনিশ শতকের শেষভাগে নানা ধরনের নাটক লিখে যাঁরা রঙ্গমঞ্চের চাহিদা পূরণে সাহায্য করেছিলেন, তাঁদেরই একজন রাজকৃষ্ণ রায়। তিনি নিজের উদ্যোগে 'বীণা' নামে একটি রঙ্গালয়ও প্রতিষ্ঠা করেন। সেখানেও তাঁর লেখা নাটকগুলি মঞ্চস্থ হয়। ইতিহাস, পুরাণ, ধর্ম, প্রহসন—সব বিষয় নিয়েই তিনি নাটক লিখেছেন। তবে কয়েকটি নাটকই কিছুটা জনপ্রিয়তা পেয়েছে, সেগুলো হল—'পতিব্রতা' (১৮৭৫), 'অবলেবিজলী' (১৮৭৮), 'হরধনুভঙ্গ' (১৮৮১), 'রামের বনবাস' (১৮৮২), 'যদুবংশ ধ্বংস' ইত্যাদি। ধাত্রী পান্নার কাহিনীকে নিয়ে লেখা ঐতিহাসিক নাটক 'বনবীর' (১৮৯২) যথেষ্ট সার্থকতা লাভ করে।

রাজকৃষ্ণের নাটকগুলো যাত্রার ঢঙে লেখা। তাই নাটকে গানের ব্যবহার করেছেন বেশি। নাট্যশিল্পের থেকেও তিনি বেশি গুরুত্ব দিতেন দর্শকদের চাহিদাকে। তাই নাটকগুলো তখনকার দর্শক মনে জায়গা পেলেও কালোত্তীর্ণ হতে পারেনি।

নাটকের সংলাপে তিনি অমিত্রাক্ষর ছন্দের ব্যবহার করেছেন। ঐতিহাসিক নাটকগুলোতে ইতিহাসের রস তেমন জমে ওঠেনি। ভক্তিরসের দিকেই নাট্যকারের ঝোঁক ছিল বেশি। পৌরাণিক নাটকের ক্ষেত্রেই তিনি বেশি সাফল্য পেয়েছেন।

প্রশ্ন ২০। 'বিসর্জন' নাটকটি কোন্ উপন্যাসের নাট্যরূপ? কত সালে প্রকাশিত? নাটকটির সম্পর্কে আলোচনা করো।

উত্তর। 'বিসর্জন' নাটকটি রবীন্দ্রনাথের প্রথম যৌবনে লেখা 'রাজর্ষি' (১৮৮৭) উপন্যাসের নাট্যরূপ, যা ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়।

নাটকটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথের বলি প্রথা বিরোধী বক্তব্য প্রকাশ পেয়েছে। ত্রিপুরার রাজা গোবিন্দমাণিক্য উপলব্ধি করেছেন, জগজ্জননী মা কোনো সন্তানের রক্তপাত করতে পারেন না। মা

সন্তানের রক্ত খায়, এমন দৃষ্টান্ত কোথাও নেই। তাই তিনি ত্রিপুরেশ্বরীর মন্দিরের পুজোয় বলি নিষিদ্ধ করেন। এতে রাজার সঙ্গে বিরোধ বাধে রাজপুরোহিত রঘুপতির। যার পরিণতিতে রঘুপতি রাজভ্রাতা নক্ষত্র রায়কে দিয়ে রাজার মৃত্যু ঘটাবার চক্রান্ত করেন। এমনকি পালিত পুত্র জয়সিংহকে প্ররোচিত করেন রাজরক্ত এনে মাতৃপূজায় নিবেদন করতে। জয়সিংহ রাজা গোবিন্দমাণিক্যকে বধ না করে, নিজেকেই রাজবংশ জাত এবং রাজরক্তের অধিকারী জেনে, মায়ের কাছে সব বিরোধের অবসান চেয়ে নিজেকেই নিজের রক্তকেই ত্রিপুরেশ্বরীকে উৎসর্গ করে দেন। তখনই—সন্তানসম জয়সিংহকে মরতে দেখে রঘুপতির সংস্কার ঘুচে যায়। তখন তিনি মানবিক হয়ে পাষাণী দেবীকে বিসর্জন দিয়ে, মনের সংস্কার বিসর্জন দিয়ে, জীবন্ত দেবী বালিকা, ভিখারিণী অপর্ণাকে 'মা' ডেকে তাকে আশ্রয় করেই পথে নেমে আসেন। প্রথাধর্ম ও ও শাস্ত্রধর্মকে ছেড়ে হৃদয়ধর্ম বা প্রেমধর্মকে আশ্রয় করে সার্থক হন।

প্রশ্ন ২১। রূপক-সাংকেতিক নাটক কাকে বলে? রবীন্দ্রনাথের প্রথম রূপক-সাংকেতিক নাটক কোন্‌টি? 'রাজা' নাটকটি রূপক-সাংকেতিক নাটক হিসেবে কতটা সার্থক, আলোচনা করো।

উত্তর। সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, ধর্মীয় বিষয় এবং উপলব্ধির ক্ষেত্রে এমন কিছু বক্তব্য থাকতে পারে, যা প্রচলিত ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। তখন তা রূপক ও সংকেতের সাহায্যে অন্যের কাছে আভাসিত করে তোলা যায়। যে নাটকে বক্তব্য বিষয়কে স্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না বলে রূপক ও সংকেতের সাহায্য নেওয়া হয়, তাকেই বলা হয় রূপক-সাংকেতিক নাটক।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম রূপক-সাংকেতিক নাটকটির নাম 'শারদোৎসব', যা প্রকাশিত হয় ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে।

রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট রূপক সাংকেতিক নাটকটির নাম 'শারদোৎসব', যা প্রকাশিত হয় ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে।

রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট রূপক সাংকেতিক নাটকগুলির মধ্যে একটি হল 'রাজা'। যা প্রকাশিত হয় ১৯১০ খ্রিস্টাব্দে। নাটকটিতে জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলনের আধ্যাত্মিক বিষয়টি রূপক ও সংকেতের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে। রাজা হলেন পরমাত্মার রূপক, আর রানী সুদর্শনা জীবাত্মার রূপক। জীব শরীর ধারণ করে কেউ ঈশ্বরকে চোখে দেখতে পায় না, দেখবার জন্য যতই ব্যাকুলতা থাক। ঈশ্বরকে দেখতে হয় অন্ধকারে, ধ্যান ও উপলব্ধির চোখ দিয়ে। সুদর্শনা যতদিন চর্মচক্ষুতে তাঁকে দেখতে চেয়েছেন, ততদিন ব্যর্থ হয়েছেন। তাঁর ভ্রান্তি ঘটেছে। তিনি দুষ্টলোককে রাজা বলে ভুল করেছেন। কাঞ্চিরাজ সুবর্ণ হ'ল বাস্তবের দম্ভ, অহংকার। তার সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্ক নেই। মানুষ ভুল করতে করতে একদিন সেটা বুঝতে পারে, যেমন বুঝেছেন রানী সুদর্শনা। অন্ধকারের রাজাকে—ঈশ্বরের স্বরূপকে বুঝতে পারলে মানুষ রানী সুদর্শনার মতই শান্ত, সংযত এবং ধ্যানস্থ হয়।

নাটকের চরিত্রগুলি প্রতীক হিসেবে, সংলাপগুলি সংকেত হিসেবে বেশ সার্থক হয়েছে। তাই, রূপক-সাংকেতিক নাটক হিসেবে 'রাজা' অবশ্যই সার্থক হয়েছে।

প্রশ্ন ২২। 'অচলায়তন' কোন্‌ শ্রেণীর রচনা? কোন্‌ সালে প্রকাশ? এর বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোচনা করো।

উত্তর। অচলায়তন রবীন্দ্রনাথের লেখা একটি রূপক-সাংকেতিক নাটক। এর প্রকাশ ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে।

নাটকটির মধ্যে দিয়ে নাট্যকার সকল প্রকার মানুষের মধ্যে সাংস্কৃতিক মিলন ঘটাতে চেয়েছেন। কেবলমাত্র নিজের সংস্কৃতিকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চাইলে প্রগতির প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়তে হয়। নাটকের অচলায়তনিকরা শাস্ত্রীয় প্রথাকে, প্রাচীন সংস্কারকে আঁকড়ে ধরেই বাঁচতে চায়। ভিন্ন সংস্কৃতির আলোবাতাসকেও তারা পাপ বলে মনে করে। তাই, সেই পাপ যাতে আয়তনে, অর্থাৎ, ব্রাহ্মণ্য সমাজে কোনো ভাবেই প্রবেশ করতে না পারে, তাই আয়তনের প্রাচীর তারা আশি ফুট উঁচু করে দেয়। কেউ কোনো ভাবে জানালা খুলে বাইরের আলো বাতাস ভিতরে ঢুকতে দিলেও তাকে শাস্ত্র মেলে শাস্তি ভোগ করতে হয়! প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। যেমন বালক সুভদ্রকে মহাতামস ব্রত করানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

এ নাটকের অচলায়তনিকরা হল রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ্য সমাজের প্রতীক। শোন্‌পাংশুরা পাশ্চাত্যপন্থী, কর্মপ্রবণ মানুষের প্রতীক, আর দর্ভকরা এদেশের শিক্ষাবঞ্চিত, নিম্নবর্ণ, নিম্নবিত্ত, সহজ সরল, ভক্তিপ্রবণ মানুষের প্রতীক। ঈশ্বর বা ধর্মগুরু তিন রূপে এই তিন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে ঘোরাফেরা করেন। কেউ তাঁকে দাদাঠাকুর, কেউ বাবাঠাকুর, কেউ গুরু বলে সম্বোধন করে। স্বয়ং গুরু এই ভেদাভেদ চান না। নাটকের শেষে তাই দাদাঠাকুর বা গুরু অচলায়তন গুঁড়িয়ে দিয়ে প্রাণোচ্ছল পঞ্চকের নেতৃত্বে সকলের সমন্বয়ে নতুন আয়তন গড়ে তোলবার উদ্যোগ হয়েছে। সেটা আর আয়তন থাকবে না, হবে মন্দির।

প্রশ্ন ২৩। 'ডাকঘর' কার লেখা কোন্ শ্রেণীর রচনা? এ রচনার তাৎপর্য বুঝিয়ে দাও।

উত্তর। 'ডাকঘর' রবীন্দ্রনাথের লেখা একটি রূপক সাংকেতিক নাটক। নাট্যকারের শ্রেষ্ঠ রূপক সাংকেতিক নাটক এই 'ডাকঘর'। যা ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশ হয়।

নাটকটির মধ্যে দিয়ে এক মুক্তিপিপাসু মানবাত্মার বেদনাকে ব্যক্ত করার চেষ্টা করেছেন। বালক অমল হল সেই মানবাত্মার প্রতীক। পার্থিব সংসার আমাদের নিজের গৃহ নয়—পিসেমশাইয়ের ঘর, আমরা সকলেই কারো না কারো ঘরে আশ্রয় পাই। ঘরওয়ালার ভালোবাসাও পাই; কিন্তু সে আমাদের আপন নয়, ক'দিনের আত্মীয় মাত্র! অথচ, মানুষ এই আত্মীয়ের নির্দেশ বা তার প্রতি কর্তব্যবোধের কারণে মুক্তি নিয়ে পথে বেরিয়ে পড়তে পারে না। এই বাধ্যবাধকতাই হল মর্ত্য মানুষের অসুস্থতা। অমল অসুস্থতার জন্য, কবিরাজের বারণের জন্য, বাইরে বেরোতে পারে না। কিন্তু বাইরের মানুষগুলোর সঙ্গে কথা ব'লে বাইরেটাকে জানতে তার প্রবল আগ্রহ। দইওয়ালা, ছেলের দল, দাদাঠাকুর, সুধা সকলের কাছেই সে বাইরের কথা জানতে চায়।

একদিন অবশ্যই অমলের মুক্তি ঘটবে, সকলেরই মুক্তি ঘটে। রাজা (ঈশ্বর) সকলকেই চিঠি পাঠিয়ে ডাকেন। ডাকঘর থেকে পিওন তাঁর চিঠি আনবে। ডাকঘর হল প্রকৃতি। রাজা বা ঈশ্বর প্রকৃতির মধ্যে দিয়েই চিঠি পাঠান। প্রকৃতির লীলার মধ্যেই সেই চিঠি পড়তে হয়। কিন্তু অমলের মতো আমরা অনেকেই সেই চিঠি পড়তে পারি না। পড়তে না পারলেও চিঠি অনুযায়ী কাজ হয়। মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে রাজা সকলেরই মুক্তির ব্যবস্থা করেন। পাঠযোগ্য তত্ত্বনাটক হিসেবে ডাকঘর অবশ্যই উচ্চাঙ্গের নাটক।

প্রশ্ন ২৪। 'মুক্তধারা' কোন্ শ্রেণীর রচনা? এর মূল বিষয় কী? কীভাবে তা পরিবেশন করা হয়েছে, আলোচনা করো।

উত্তর। 'মুক্তধারা' রবীন্দ্রনাথের লেখা একটি রূপক-সাংকেতিক নাটক। এ নাটকের মূল দ্বন্দ্ব হল বিজ্ঞান শক্তির সঙ্গে মানবতার দ্বন্দ্ব।

উত্তরকূটের অভিজাত, বিত্তবান, স্বার্থপর মানুষেরা বিজ্ঞান শক্তি প্রয়োগ করে ভগবানের দেওয়া নদীর জল বেঁধে রেখেছে, ফলে শিবতরাইয়ের দরিদ্র মানুষেরা জল থেকে বঞ্চিত হতে থাকে। শিবতরাইয়ের মানুষ অন্যায়ের প্রতিবাদ করল। কিন্তু দুর্বলের প্রতিবাদকে কেউ গ্রাহ্য করল না। ধনঞ্জয়ের নেতৃত্বে বিদ্রোহ হল। তবু কারো মন গলল না। তখন রাজপুত্র অভিজিত মানুষের মঙ্গল করতে—বহু মানুষের প্রাণরক্ষার ব্যবস্থা করতে বাঁধ ভাঙতে গেল। ভাঙা যখন সম্ভব হল, তখন জলের তোড়ে অভিজিত ভেসে গেল। মানুষের কল্যাণ সাধন করতে গিয়ে অভিজিৎ আত্মোৎসর্গ করল।

এ নাটকে অভিজাত বিত্তবানদের শোষণ পীড়নের ছবি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। উত্তরকুটের মানুষ শিবতরাইয়ের মানুষকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেয়, পারিশ্রমিক দেয় না। বরং, শিবতরাইয়ের উন্নতি ঘটার সম্ভাবনা দেখা দিলে উত্তরকুটের মানুষ তাতে বিঘ্ন ঘটায়। কৃষি, বাণিজ্য, শিক্ষা সর্বক্ষেত্রেই বিঘ্ন ঘটানো হয়। মৃত মানুষদের জন্যও তাদের সহানুভূতি থাকে না। তবে এমন পাপ দীর্ঘস্থায়ী হয় না। একদিন যন্ত্রের ক্ষমতাও লোপ পায়, বাঁধ ভেঙে যায়। তবে মূল্যও দিতে হয়। যেমন, এক্ষেত্রে অভিজিতের মৃত্যু ঘটে গেল।

প্রশ্ন ২৫। 'রক্তকরবী' নাটকের প্রথম নাম কী? রক্তকরবী কীসের প্রতীক? এই নাটকের বিষয়বস্তু আলোচনা করে রূপক-সাংকেতিক নাটক হিসেবে এর সার্থকতা বিচার করো।

উত্তর। 'রক্তকরবী' নাটকটি যখন লেখা হয়, তখন এর নামকরণ হয়েছিল—'যক্ষপুরী'। তবে রূপক-সাংকেতিক নাটকের বস্তুধর্মী নাম যথার্থ নয়। তাই ব্যঞ্জনধর্মী নাম হয় 'রক্তকরবী' (১৯২৬)। রক্তকরবী একই সঙ্গে সজীবতার, জীবনধর্মের, প্রাণের প্রতীক।

নাটকটির মধ্যে দিয়ে খনি-উৎপাদন, পুঁজিবাদ, বিত্তবাসনা, যান্ত্রিক জীবন—এ সবের সঙ্গে দ্বন্দ্বে হৃদয়ধর্মের জয় দেখানো হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ চিরকালই হৃদয়ধর্মকে সবার উপরে স্থান দেন। যক্ষপুরীর রাজা খনি থেকে তাল-তাল সোনা তুলিয়ে নিজে সোনার পাহাড় সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু যারা সোনা তোলে, তাদের দারিদ্র্য ঘোচেনি। অঢেল সম্পদের মালিক রাজা আভিজাত্য আর নিরাপত্তার কারণে নিজের চারিদিকে জাল সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু অন্তরে তার তৃপ্তি নেই। শান্তি নেই। কারণ, তিনি সম্পদ লাভ করলেও ভালোবাসা কারো কাছ থেকে পাননি। নন্দিনী রাজার জালের বাইরে দাঁড়িয়ে বারবার ডেকে অন্তরে চাপা পড়ে যাওয়া হৃদয়বৃত্তিকে পুনর্জাগরিত করেছে। —রাবণ সত্তার নীচ থেকে বিভীষণ সত্তাকে টেনে বের করেছে। তাই রাজা শেষ পর্যন্ত যক্ষপুরীর বাইরে বেরিয়ে এসেছেন। মুক্ত প্রান্তরে সকলের সঙ্গে ধ্বজা পূজায় অংশ নিয়েছেন।

যক্ষপুরীর শ্রমিক বিশু, ফাগুলাল, চন্দ্রা—এঁরাও যন্ত্রসভ্যতার শিকার, নিয়মের আর সংস্কারের চাপে এদেরও হৃদয়বৃত্তি লুপ্ত হবার দশা। নন্দিনী এদের মধ্যেও হৃদয় বৃত্তিকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছে। রূপক আর প্রতীক ব্যবহারের মাধ্যমে হৃদয়ধর্মের জয় বেশ সার্থকভাবেই দেখানো হয়েছে। তাই 'রক্তকরবী' নাটককে সার্থক রূপক-সাংকেতিক নাটক বলতে পারি।

প্রশ্ন ২৬। রবীন্দ্রনাথের প্রহসনধর্মী প্রথম নাটকটির নাম কী? কত সালে প্রকাশিত? এই শ্রেণীর নাটক রচনায় তাঁর কৃতিত্ব আলোচনা করো।

উত্তর। রবীন্দ্রনাথের প্রহসনধর্মী প্রথম নাটকটির নাম 'গোড়ায় গলদ'। এটি প্রকাশিত হয় ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে।

প্রচলিত ধারায়, সাধারণ দর্শকদের খুশি করবার জন্য রবীন্দ্রনাথ কখনও নাটক লিখতে চান নি। বাস্তব বিষয় নিয়ে নাটক লিখলেও তার ভঙ্গি, ভাষা, তার রসপরিণতি অর পাঁচনের নাটকের মতো হয় নি। উনিশ শতকের নাট্যকারেরা প্রায় সকলেই দু'একটা করে প্রহসন রচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথও কৌতুক রস আস্বাদন করাবার জন্য প্রহসনধর্মী কয়েকটি নাটক লিখেছেন, তবে সে সব নাটক অন্যদের লেখা প্রহসনের মতো নয়। রবীন্দ্রনাথ চিরকালই রুচিবান মানুষ। মানুষকে হাসাবার জন্য তিনি কখনও ভাঁড়ামি বা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের আশ্রয় নিতেন না। অন্যরা যেখানে Satire জাতীয় হাস্যরসের দিকে ঝুঁকেছেন, রবীন্দ্রনাথ সেখানে Wit জাতীয় হাস্যরস সৃষ্টিতেই আগ্রহী থেকেছেন।

রবীন্দ্রনাথের প্রহসনধর্মী রচনাগুলি হল 'গোড়ায় গলদ' (১৮৯২), বৈকুণ্ঠের খাতা' (১৮৯৭), 'চিরকুমার সভা' (১৯২৫), 'শেষরক্ষা' (১৯২৮)। এই সব কৌতুক নাটক হাস্যরস আস্বাদন করানোর ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্বের পরিচয় বহন করে। এক একটা রচনায় এক একটা বিষয়কে তুলে ধরা হয়েছে। বৈকুণ্ঠের খাতায় দেখি, আত্মভোলা বৈকুণ্ঠ নিজের লেখা খাতা নিয়ে সকলকে লেখা পড়াতেই ব্যস্ত। সংসার নিয়ে ভাবার মতো বোধ তার নেই। তার এই অজ্ঞতা বা অতি সারল্যই কৌতুকের কারণ হয়েছে।

'চিরকুমার সভা'য় চিরকুমার থাকার সংকল্প করে যে সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই সভাকেই প্রজাপতির মন্দির বানিয়ে অবিবাহিত ছেলেমেয়েরা মনের মতো পাত্রপাত্রী পছন্দ করে বিয়েটা সেরে নেয়। এখানেই কৌতুক। অন্যান্য প্রহসনকারদের উদ্দেশ্য ছিল সামাজিক মানুষের চারিত্রিক ত্রুটিবিচ্যুতিগুলিকে ব্যাঙ্গের চাবুকে শোধন করা। রবীন্দ্রনাথ তেমন উদ্দেশ্য নিয়ে প্রহসনধর্মী নাটক লেখেননি, তবু উন্নত মানের, উন্নত রুচির কৌতুকরসের সাহিত্য হয়ে উঠেছে।